১০ কোটি টাকার সিসি ক্যামেরা দুর্নীতিতে আলোচিত ঢাকার এসপি আনিসুজ্জামান

সংগৃহীত ছবি

ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামানের বিরুদ্ধে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য পাওয়া ১০ কোটি টাকা আত্মসাৎ, বদলি ও রেকার বাণিজ্যসহ গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। আওয়ামী লীগ আমলে সুবিধাভোগী হলেও এখন নিজেকে বিএনপি মহাসচিবের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে প্রভাব দেখান তিনি। বিলাসী জীবনযাপন ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে প্রশাসনও অস্বস্তিতে। অভিযোগগুলোর স্বচ্ছ তদন্তের দাবি তুলছেন বিশ্লেষকেরা।

ঢাকা জেলা পুলিশের এসপি আনিসুজ্জামান সিসি ক্যামেরা বসানোর জন্য বরাদ্দ পাওয়া ১০ কোটি টাকা আত্মসাৎ–এর অভিযোগে আবারও আলোচনায়। বিসিএস ২৫ ব্যাচের এই কর্মকর্তা আওয়ামী লীগ আমলে সুবিধাভোগী হলেও এখন নিজের পরিচয় বদলে বিএনপি মহাসচিবের ভাগ্নে পরিচয় দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রভাব খাটানোর অভিযোগ রয়েছে। ঠাকুরগাঁওয়ের বাসিন্দা হওয়ায় স্থানীয় পর্যায়ে তাঁকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার চাপও তৈরি হয়েছে বলে জানা গেছে।

তাঁর বিরুদ্ধে অর্থের বিনিময়ে বদলি বাণিজ্য, রেকার সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই ঘুরছে। ব্যক্তিগত জীবনযাপন নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন—গুলশান ক্লাবে রাতভর আড্ডা দেওয়া, অতিরিক্ত বিলাসী খরচ, এমনকি ২৫ হাজার টাকা দিয়ে চুল ছাঁটা—এসব আচরণ তাঁকে আরও বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড় করিয়েছে। টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান মনে করেন, পুলিশ আইনের রক্ষক হলেও বহু ক্ষেত্রে তারাই ক্ষমতার অপব্যবহার করছে; সরাসরি অপরাধে জড়িতদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা ছাড়া পরিস্থিতির উন্নতি সম্ভব নয়।

রাজধানীর কেরানীগঞ্জে অপরাধ দমন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বসুন্ধরা গ্রুপ ২০২৩ সালে ঢাকা জেলা পুলিশকে ১০ কোটি টাকার অনুদান দেয় সিসি ক্যামেরা স্থাপনের জন্য। তবে প্রায় এক বছরেও একটি ক্যামারাও বসানো হয়নি বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। ফলে বিপুল অর্থের ব্যবহারে অস্বচ্ছতা ও অনিয়মের প্রশ্ন উঠেছে। পুরো প্রকল্পটি এখন বিতর্কে ঘেরা।

পুলিশের একাধিক সাবেক কর্মকর্তা জানান, চেক পাওয়ার পর 'ঢাকা জেলা সিসি ক্যামেরা স্থাপন' নামে দুটি ব্যাংকে পৃথক অ্যাকাউন্ট খোলা হয় এবং সেখান থেকে ৮ কোটি টাকা তুলে এফডিআর করা হয়। পরে পরামর্শক নিয়োগ ও সংস্কারের নামে প্রায় ২২ লাখ টাকা খরচ দেখানো হয়। এ সময় একাধিকবার পুলিশ সুপার বদল হওয়ায় প্রকল্পের দায়িত্বও পালাবদল হয়। অভিযোগ রয়েছে, দায়িত্ব গ্রহণের পর বর্তমান পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান প্রকল্পের টাকা নিজস্ব অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করেছেন। একই সঙ্গে তার বিরুদ্ধে রেকার রসিদ দিয়ে টাকা আদান–প্রদান, ঘুষ গ্রহণ এবং বদলি–বাণিজ্যের মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে।

এসপি আনিসকে ঘিরে নানা বিতর্ক আগে থেকেই আলোচিত। অভিযোগ রয়েছে, বিপুল অর্থের বিনিময়ে তিনি ২৫তম বিসিএসে প্রথম হয়ে পুলিশ ক্যাডারে প্রবেশ করেন এবং বিভিন্ন জায়গায় দায়িত্ব পালনকালেই তার বিরুদ্ধে অনিয়ম, ক্ষমতার অপব্যবহার ও রাজনৈতিক পরিচয় ব্যবহার করে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ ওঠে। ঢাকা জেলা পুলিশের দায়িত্বে আসার পর এসব অভিযোগ আরও গতি পায়। তার বিলাসী জীবনযাপন, ব্যয়বহুল সেলুনে নিয়মিত যাতায়াত এবং সহকর্মীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বদলি বা সাসপেন্ড করার বিষয়গুলোও বহুবার আলোচনায় আসে।

পুলিশের অভ্যন্তরীণ সূত্র জানায়, জেলা পুলিশ কার্যালয় থেকে বিশেষ রেকার রসিদ ছাপিয়ে ত্রুটিপূর্ণ গাড়ির মালিকদের ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করা হতো এবং গাবতলী বাস টার্মিনালে অবৈধ বা ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে মামলা না করার শর্তে মাসিক নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা তোলা হতো। এর ফলে সরকারি খাতে জরিমানার পরিমাণ কমে আসে এবং এসব অনিয়মে জড়িত হওয়ার অভিযোগও আনিসুজ্জামানের বিরুদ্ধে রয়েছে।

অন্যদিকে সাবেক এসপি আসাদুজ্জামান জানান, দায়িত্ব বদলের কারণে তিনি প্রকল্পটি শুরু করতে পারেননি এবং সব অর্থ ও নথি আহমেদ মুয়ীদের কাছে হস্তান্তর করেন। আহমেদ মুয়ীদও দাবি করেন, দায়িত্ব পালনের সময় স্বল্প হওয়ায় তিনি কাজ এগিয়ে নিতে পারেননি এবং পরবর্তী এসপি আনিসুজ্জামানকে পুরো প্রকল্প বুঝিয়ে দেন। বসুন্ধরা গ্রুপের একজন কর্মকর্তা জানান, অপরাধ মোকাবেলায় দেওয়া ১০ কোটি টাকার অনুদান এখনও কোনো ফলাফল দেয়নি, যা হতাশাজনক।

অভিযোগ বিষয়ে এসপি আনিসুজ্জামান নিজের অবস্থান জানিয়ে বলেন, টাকা আত্মসাৎ হয়নি, ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের অভিযোগ মিথ্যা এবং সিসি ক্যামেরা স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছিল, তবে কিছু অনিয়মের কারণে তা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। তবে পুলিশ সূত্রের দাবি—তিনি নিজ নামে অ্যাকাউন্ট খুলে টাকার রুট পরিবর্তন করেছেন, যা তদন্তের দাবি রাখে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিয়োগে অনিয়মের মাধ্যমে যারা প্রশাসনে প্রবেশ করে, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। ঢাবির অপরাধ বিশ্লেষক ড. তৌহিদুল হক মনে করেন, এসব অনিয়ম ও দুর্নীতি রোধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে পুলিশ প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং সাধারণ মানুষের আস্থা আরও কমে যাবে।

সূত্র: প্রতিদিনের বাংলাদেশ